নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত রোডম্যাপ বাস্তবায়ন: আমরা কোথায়?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২১ জানুয়ারি, ২০০৮)

গত ১৫ জুলাই, ২০০৭ তারিখে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। রোডম্যাপে পরবর্তী দেড় বছরের জন্য ২১টি কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কোন কাজটি কত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে তা বলা হয়েছে। রোডম্যাপটি জাতির কাছে কমিশনের প্রতিশ্রুতি এবং কমিশনকে এ ব্যাপারে দায়বদ্ধ করা আবশ্যক। আরো আবশ্যক এ সকল কাজগুলো স্বচ্ছতার সাথে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন। আমরা নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত রোডম্যাপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে আছি তা মূল্যায়নই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সংবাদপত্রে প্রকাশিত নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব মূল্যায়নের তথ্য, যা গত বছরের শেষে সংকলিত, এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

রোডম্যাপে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম

রোডম্যাপ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা মূল্যায়নের আগে এতে কী আছে সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কমিশনের রোডম্যাপকে মোটাদাগে ছয়টি ভাগে বিভাজন করা হয়েছে। এগুলো হলো: (১) নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, (২) নির্বাচনী সংস্কার, (৩) ভোটার তালিকা প্রণয়ন, (৪) নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ, (৫) স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়কাল, এবং (৬) সংসদীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচি।

প্রত্যেকটি বিভাজনের অধীনেও আরো কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের আওতায় দু'টি বড় কাজ অন্তর্ভুক্ত, যা হলো কমিশনারদের নিয়োগ এবং কমিশনের আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন। আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো হলো: (ক) কমিশনের পদস্থ কর্মকর্তাদের বদলী ও সচিবালয় পুনর্গঠন, (খ) কমিশনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, (গ) কমিশনের দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ, (ঘ) বিতর্কিত ৩০৪ উপজেলা ও নির্বাচন কর্মকর্তার যোগ্যতা পরীক্ষার ভিত্তিতে তাদের স্থায়ীকরণ অপসারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, (ঙ) নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরদের নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ, এবং (চ) নির্বাচন কমিশনের আইটি উইং জোরদারকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

নির্বাচনী সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো হলো: (ক) আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, (খ) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনা, (গ) গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা, (ঘ) রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা, এবং (ঙ) আইনি সংস্কার অনুমোদন ও অধ্যাদেশ জারি।

ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো হলো: (ক) পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি নির্ণয়; (খ) শ্রীপুর পাইলট প্রকল্প; (গ) আইসিটি অবকাঠামো নির্ণয়ে সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও বিন্যাস; (ঘ) সফট্ওয়্যার ডেভেলপমেন্ট; (ঙ) মাঠ পর্যায়ের কর্মীবাহিনী নিয়োগ ও পদায়ন; (চ) উপাত্ত সংগ্রহ ও ডাটা এন্ট্রি; (ছ) খসড়া ভোটার তালিকা মুদ্রণ, প্রকাশ ও সংশোধন; এবং (জ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা মুদ্রণ ও বিতরণ।

নির্বাচনকে দু'ভাগে বিভাজন করা হয়েছে – স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অন্তর্ভুক্ত। সংসদীয় নির্বাচনের জন্য কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান। সংসদ নির্বাচনের জন্য অবশ্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আবশ্যক, যেক্ষেত্রে সাংবিধানিক ও আইনি বাধ্যবাধকতা বিরাজমান।

রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সফলতা

এ কথা সকলেরই জানা যে, বিচারপতি আজিজের নেতৃত্বের পাঁচ সদস্যের নির্বাচন কমিশনকে বাদ দিয়ে গত ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে এটিকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন মোটামুটি সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

কমিশনের আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন কাজের অধিকাংশ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে কমিশন দাবি করছে। কমিশন নিজেকে এজন্য ৭১ শতাংশ নম্বর দিয়েছে। তবে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখনো শেষ হয় নি তা হলো কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা। প্রথমদিকে সংবিধান সংশোধন করতে হবে এমন যুক্তি প্রদর্শন করলেও, জনদাবির প্রেক্ষিতে কমিশন তার মত পরিবর্তন করে এবং এ লক্ষ্যে আইনি পদক্ষেপের উদ্যোগ নেয়। শোনা যায় যে, কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শীগগিরই আইন আসছে, যদিও অনেকেই মনে করেন যে, সরকারি কার্যবিধি প্রণালী সংশোধন করেই তা অতি সহজেই করা সম্ভব হতো। উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের 'এনাম কমিটি'র রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারি কার্যবিধি প্রণালীর পরিবর্তন করেই জেনারেল এরশাদের শাসনামলে নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়কে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধিনস্ত হয়। একইসাথে কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতাও নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়টি বর্তমানে ঝুলে আছে। কমিশন *ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭* ইতোমধ্যে জারি করেছে, যদিও আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা হয় নি। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ২০০৭*-এর খসড়া তৈরি করে কমিশন রাজনৈতিক দলের

সাথে আলোচনা শুরু করলেও, বিএনপি'র এক গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়, ফলে আলোচনা শেষ করা যায় নি। তাই *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে*'র খসড়াটিও এ পর্যন্ত চূড়ান্ত করা সম্ভবপর হয় নি।

বাংলাদেশ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য রোডম্যাপ বা সময়সূচি (২০০৭-২০০৮)

ক্রম	প্রক্রিয়া/কার্যক্রম	সময়সীমা	অর্জন	মন্তব্য
১.	**নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন**	**ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর '০৭**		
২.	কমিশনারদের নিয়োগ	ফেব্রুয়ারি '০৭	১০০%	
৩.	অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন	ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর '০৭	৭১%	কমিশনের স্বধীনতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি।
৪.				
৫.	**নির্বাচনী সংস্কার**	**ফেব্রুয়ারি '০৭-ফেব্রুয়ারি '০৮**		
৬.	আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার	ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর '০৭	৬৯%	
৭.	বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনা	এপ্রিল-ডিসেম্বর '০৭	৬১%	
৮.	গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা	মে-ডিসেম্বর '০৭	৫৪%	
৯.	রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা	সেপ্টেম্বর- নভেম্বর '০৭	২৬%	আদালতে বিচারাধীন
১০	আইনী সংস্কার অনুমোদন ও জারি	সেপ্টেম্বর '০৭-ফেব্রুয়ারি '০৮	১৩%	
১১.				
১২.	**ভোটার তালিকা প্রণয়ন**	**এপ্রিল '০৭- অক্টোবর '০৮**		
১৩.	পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি নির্ণয়	এপ্রিল-জুন '০৭	১০০%	
১৪.	শ্রীপুর পাইলট	জুন '০৭	১০০%	
১৫.	আইসিটি অবকাঠামো নির্ণয়ে সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও বিন্যাস	জুন-অক্টোবর '০৭	৮৩%	
১৬.	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	জুন-আগস্ট '০৭	১০০%	
১৭.	মাঠ পর্যায়ের কর্মী বাহিনী নিয়োগ ও পদায়ন	জুলাই-নভেম্বর '০৭	৫৩%	
১৮.	উপাত্ত সংগ্রহ ও ডাটা এন্ট্রি	আগস্ট '০৭-জুন '০৮	১৫%	প্রতি মাসে গড়ে ১ কোটি ভোটার নিবন্ধিত হচ্ছে
১৯.	খসড়া ভোটার তালিকা মুদ্রণ, প্রকাশ ও সংশোধন	অক্টোবর '০৭-আগস্ট '০৮		
২০.	চূড়ান্ত তালিকা মুদ্রণ ও বিতরণ	আগস্ট-অক্টোবর '০৮	০%	
২১.				
২২.	**নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ**	**জানুয়ারি-জুন '০৮**		
২৩.	সীমানা নির্ধারণ	জানুয়ারি-জুন '০৮	১৬%	কমিশন অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে বলে দাবি করছে
২৪.				
২৫.	**নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়কাল**	**জানুয়ারি-ডিসেম্বর '০৮**		
২৬.	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার নির্বাচন	জানুয়ারি '০৮-ডিসেম্বর '০৮	১০%	আইন সংশোধন ও নির্বাচনী বিধি প্রণয়নের কাজ চলছে
২৭.	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন	জানুয়ারি-ডিসেম্বর '০৮	১২%	
২৮.	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন	নভেম্বর-ডিসেম্বর '০৮	১২%	
২৯.				
৩০.	**সংসদীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচি**	জুন-ডিসেম্বর '০৮		
৩১.	রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের সর্বশেষ সময়সীমা	জুন '০৮	২০%	
৩২.	নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও সংসদ নির্বাচন	অক্টোবর-ডিসেম্বর '০৮	২১%	

'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকে'র মতো অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সুপারিশের আলোকে প্রণীত নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত হলে রাজনৈতিক দলগুলোর কমিশনের অধীনে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হবে। ফলে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র, দলের আর্থিক স্বচ্ছতা ও নিজেদের প্রাথমিক সদস্যদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। একইসাথে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে, প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগতমানে পরিবর্তনের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। কিন্তু বিএনপি'র সাথে আলোচনার বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকায় পুরো প্রক্রিয়াটিই স্থগিত হয়ে

গিয়েছে। ফলে অনেকেই এখন সংস্কারের সম্ভাবনা নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠছেন। কেউ কেউ রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনায় কমিশনের সময়সীমার দীর্ঘসূত্রিতাকে এজন্য দায়ী করছেন।

এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের দু'টি অপারগতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। প্রথমত, ২২ জানুয়ারি ২০০৭ সালের অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের দেয়া তথ্যগুলো (তাদের আয়-ব্যয়, সম্পদ, দায়-দেনার হিসাব ইত্যাদি) আমরা 'সুজনে'র পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি দিয়ে বিধিসম্মতভাবে যথাসময়ে দরখাস্ত করলেও অনেক রিটার্নিং অফিসার তা দিতে ব্যর্থ হন। আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলেও নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে এ অজুহাতে নির্বাচন কমিশনও এ ব্যাপারে আমাদেরকে সহায়তা প্রদান করতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয়ত, অনেকের স্মরণ আছে যে, ২০০৫ সালের মে মাসে বাংলাদেশ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে একটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন। পরবর্তীতে সম্পূর্ণ জালিয়াতির মাধ্যমে জনৈক আবু সাফা এর বিরুদ্ধে আপিল করে এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি জে আর মুদাচ্ছির হোসেনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ রায়টি খারিজ করে দেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের একাধিক মৌখিক ও লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন জনস্বার্থে এ মামলার পক্ষ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে অবশ্য 'সুজনে'র পক্ষ থেকে আপিলকারীর জালিয়াতির তথ্য উদঘাটন করা হলে এবং বিজ্ঞ আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেনের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে প্রধান বিচারপতি এম রুহুল আমিনের নেতৃত্বের আপিল বিভাগের পূর্ণ বেঞ্চ হাইকোর্টের রায়টি বহাল রাখে। নির্বাচন কমিশন তাদের খসড়া *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে* ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের বিধান রাখলেও, সুপ্রিম কোর্টের রায় অন্যরকম হলে এ অধিকার নিশ্চিত করা যেত কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন জনস্বার্থ রক্ষা করার তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ণের ব্যাপারে, যা ছিল গণদাবি, কমিশন অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে বলে দাবি করা হয়। শ্রীপুরের পাইলট প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে শোনা যায়, যদিও এ ব্যাপারে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ অনেকের কাছে কাম্য ছিল। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছরের শেষ পর্যন্ত দুই কোটির বেশি ভোটার নিবন্ধন করা হয়েছে। এর মধ্যে গত আগস্ট মাসে নিবন্ধিত হয়েছে ৬.৫৮ লাখ, সেপ্টেম্বরে ১২.৫৯ লাখ, অক্টোবরে ১৮.৩০ লাখ, নভেম্বরে ৬৬.৪১ লাখ এবং ডিসেম্বরে ১.০২ কোটি। তালিকা প্রস্তুতের প্রাথমিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠার ফলে আগামীতে প্রতিমাসে গড়ে অন্তত ১ কোটি ভোটার নিবন্ধিত করা হবে বলে কমিশন দাবি করছে। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, জুন ২০০৮-এর আগেই ভোটার তালিকা তৈরির কাজটি সম্পন্ন হবে। তবে নতুন *ভোটার তালিকা অধ্যাদেশে*'র অধীনে বিধি প্রণয়ন না করে তালিকা প্রস্তুতের কাজটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজে কমিশন ইতোমধ্যে হাত দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে কমিশনের এ পদক্ষেপে নির্বাচনকে বিলম্বিত, এমনকি ভণ্ডুল করার পাঁয়তারা হিসেবে দেখছে। প্রতি আদমশুমারির পর নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের ব্যাপারে সাংবিধানিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাই এ কাজটি না করে নির্বাচনের উদ্যোগ নিলে যে কেউ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন এবং নির্বাচনের পরেও ফলাফল নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তুলতে পারেন। তাই সীমানা নির্ধারণের কাজে হাত দিয়ে কমিশন সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে বলে আমরা মনে করি।

কমিশন মেয়াদ উত্তীর্ণ পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন এপ্রিল, ২০০৮-এ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। পরবর্তীতে, বর্তমান বছর শেষ হওয়ার আগে, মেয়াদ উত্তীর্ণ পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও কমিশন বলছে। কমিশনের রোডম্যাপে জেলা পরিষদের নির্বাচনের কথা উল্লেখ না থাকলেও এ নির্বাচনও সম্ভবত কমিশনকে করতে হবে। তবে অনেকে, বিশেষত কিছু রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধীতা করছে। এর মাধ্যমে বর্তমান সরকার 'কিংস পার্টি' গড়ে তুলতে পারে বলে তারা আশংকা করছে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যাপারেও সাংবিধানিক ও আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।" আর নির্বাচন ছাড়া স্থানীয় সরকার গঠিত হয় না। এ কারণে বিদ্যমান আইনে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে প্রত্যেকটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক। এছাড়াও *কুদরত-ই-এলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ* [৪৪ডিএলআর(এডি)(১৯৯২)] মামলার রায়ে ১৯৯২ সালে, সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ কার্যকর করার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সর্বসম্মতভাবে ৬ মাসের মধ্যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা অনির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে স্থলাভিষিক্ত' করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাই সময়সীমার এ সকল বাধ্যবাধকতা স্মরণ রেখে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে যখন সম্ভব হবে তখনই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল স্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। এছাড়াও সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে, সর্বস্তরে, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা জরুরি। উপরন্তু, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় সংসদ কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক উপরি কাঠামোর খুঁটিস্বরূপ, আর ১১ জানুয়ারি ২০০৭ এর ঘটনাবলীর থেকে এটি সুস্পষ্ট যে খুঁটিহীন গণতন্ত্র বা পিলারলেস ডেমোক্রেসি মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। খুঁটি এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন স্থগিত করার প্রস্তাব অযৌক্তিক, অনৈতিক এবং সর্বোপরি আইন বহির্ভূত। আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে কার্যকর, শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রায় সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যেতে পারে। কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সর্বস্তরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও গতিশীল করার সুস্পষ্ট ওয়াদা বারবার বরখেলাপ করেছে।

রাজনৈতিক দলগুলো এবং নাগরিক সমাজের দাবি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে একটি নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, তারাও তা করতে সচেষ্ট। তবে সংসদ নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সম্পন্নকরণ, সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ, অধ্যাদেশ জারিসহ আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করতে হবে। এ কাজগুলো কমিশন সম্পূর্ণ সততা ও আন্তরিকতার সাথে করছে বলে দাবি করছে, যে দাবির ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ আমরা দেখি না।

রাজনৈতিক দলের প্রস্তুতি

এটি সুস্পষ্ট যে, একটি রোডম্যাপ ঘোষণার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেছে। তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ। তাই দ্রুত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি প্রয়োজন। আমাদের প্রধান দলগুলো কি সে প্রস্তুতি নিচ্ছে?

এ কথা আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সত্যিকারার্থে কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী করতে হলে আমাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন জরুরি। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা আবশ্যক, যাতে তারা মনোনয়ন বাণিজ্য এবং নির্বাচনে কালোটাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার থেকে দূরে থাকে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা করে। তাহলেই একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগতমানে পরিবর্তন আসবে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়ার পথ সুগম হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ১/১১-এর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া রোধ করার লক্ষ্যে দলীয় সংস্কারের কথা মুখে মুখে বললেও, বাস্তবে এ ব্যাপারে কোন কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বরং তারা দেশব্যাপী ঘরোয়া রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের শর্ত আরোপ করছে। অনেকের মতে, এ সকল শর্ত অজুহাত মাত্র, কারণ বর্তমান অবস্থায়ও রাজনৈতিক দলের পক্ষে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া সম্ভব। আর রাজনৈতিক দলগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের সংস্কারের উদ্যোগ না নিলে, দ্রুত নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে যেতে পারে। এছাড়াও রাজনৈতিক দলের সদাচারণ ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনও অসম্ভব!

পরিশেষে, নির্বাচন কমিশনের রোডম্যাপে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কমিশনের পুনর্গঠন, নির্বাচনী আইন ও বিধি-বিধানের সংস্কার, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণসহ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয়া হয়েছে। কমিশনের দাবি অনুযায়ী, এ সকল কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। গত সাড়ে পাঁচ মাসে কমিশন তাদের সার্বিক অর্জন ৪০ শতাংশ বলে দাবি করছে, যা ছিল জনাব এবিএম মূসার ভাষায়, মূলত 'ট্রাক মেরামতের' কাজ। তবে পরবর্তী কাজগুলো আরো দ্রুততার সাথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

নির্বাচন কমিশন রোডম্যাপ অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও অনেকের মনে নির্বাচন নিয়ে গুরুতর সন্দেহ বিরাজ করছে। এ সন্দেহ দূর করার লক্ষ্যে আমাদের মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অবশ্য অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি বারবার ব্যক্ত করেছেন। এমনকি সেনাবাহিনী প্রধানও দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবার দৃঢ় প্রত্যয় একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন। এ সন্দেহ দূর করার জন্য এখন সংশ্লিষ্ট সকলকে অত্যন্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ কোন অবস্থায়ই অনির্বাচিত সরকারকে বেশিদিন ক্ষমতায় রাখা কিংবা সামরিক শাসন কায়েম করা জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। এজন্য আজ রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজকেও দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। তাদেরকে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি সহায়তার হস্ত প্রসারিত করতে হবে, কারণ দ্রুত ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও পরবর্তীতে কেউ যেন রাজনীতিবিদদের অসহযোগিতার অজুহাত তুলতে না পারে!

উপরন্তু, অনেকের মতে দ্রুত ও সুষ্ঠু নির্বাচনই যথেষ্ট নয় – নির্বাচন হতে হবে অর্থবহ যার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন ঘটবে। এজন্যও রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের সংস্কারের লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে। আজ অনেকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন: দ্রুত ও সুষ্ঠু নির্বাচন, তারপর কী? ১/১১-এর পূর্বাবস্থা? আশা করি, আমদের সম্মানিত রাজনীতিবিদগণ জনগণের অস্বস্তির এ বিষয়টি তাঁদের বিবেচনায় নেবেন।

আমরা আরো আশা করি যে, নির্বাচন কমিশন তাদের কার্যক্রমগুলো স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করবে, যাতে আমাদের মতো নাগরিক সংগঠনের পক্ষে এগুলো নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা সম্ভবপর হয়।